ECOCRITICISM O BANGLA SAHITYA : A Collection of Articles
on various aspects of Ecocriticism
Edited by Susanta Mondal
Published by Debarati Mallik
Diya Publication : 44/1-A Beniatola Lane, Kolkata 700009

গ্রন্থস্বত্ব : সুশান্ত মণ্ডল
প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া কোনও উপায়েই এই গ্রন্থের
কোনও অংশের কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না।
এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ECOCRITICISM O BANGLA SAHITYA : A Collection of Articles on various aspects of Ecocriticism

by *Susanta Mondal*

Published by
Diya Publication, 44/1A Beniatola Lane, Kolkata-700009
Phone : 6291811415/9830444918
e-mail : diyapublication@gmail.com
Website : www.diyapublication.com
facebook : দিয়া পাবলিকেশন কলকাতা

ISBN : 978-93-87003-38-5

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি, ২০২১

মূল্য ৪০০/-

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যে প্রকৃতি ও পরিবেশ/আরিফ শেখ
২৫১

ইকোক্রিটিসিজম ও বিনয় মজুমদার/শ্যামশ্রী বিশ্বাস সেনগুপ্ত
২৫৮

বুদ্ধদেব গুহর 'শালডুংরি' : ইকোক্রিটিসিজমের আলোকে/পবিত্র কুমার মিস্ত্রী
২৬৩

বাস্তুতন্ত্রবাদ (ইকোক্রিটিসিজম) এবং প্রসঙ্গত ভগীরথ মিশ্রের উপন্যাস/হাসনুহেনা
২৭১

পরিবেশকেন্দ্রিক সাহিত্য-সমালোচনা ও স্বপ্নময় চক্রবর্তী'র গল্পবিশ্ব/বিকাশ রায়
২৮২

কিন্নর রায়ের 'প্রকৃতি পাঠ' : চিন্তনের নবনির্মাণ/নুনম মুখোপাধ্যায়
২৯৬

ইকোক্রিটিসিজম : কিন্নর রায়ের (নির্বাচিত) ছোটোগল্প/মহাদেব মণ্ডল
৩০৩

ইকোক্রিটিসিজিমের নিরিখে সোহারাব হোসেনের উপন্যাস—
'মাঠ জাদু জানে'/তন্বী হালদার
৩১২

ইকোফিকশনের আলোকে অনুপম দত্তের 'বোঙারুম
নাচ ও শকুন কথা'/গিরিধারী মণ্ডল
৩১৬

পরিবেশ ভাবনা : যুধান কথা ও কয়েকটি গল্প/সুকান্তি দত্ত
৩২১

'কাস্তে' উপন্যাস অবলম্বনে মহারাষ্ট্রের সাম্প্রতিক ইতিহাসে
'দুষ্কালে'র প্রেক্ষিত অনুসন্ধান/সৌরভ বাঁক
৩২৭

সংকটের প্রেক্ষাপটে সুন্দরবনের জল-জঙ্গলজীবী/শঙ্করকুমার প্রামাণিক
৩৩৮

বুদ্ধদেব গুহর 'শালডুংরি' : ইকোক্রিটিসিজমের আলোকে

পবিত্র কুমার মিস্ত্রী

'Ecology' শব্দটি ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়কার হলেও 'Ecocritism' শব্দটি বেশ নতুন। William Rueckert ১৯৭৮ সালে এই শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। পরবর্তী সময়ে সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে এই শব্দটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

ইকোক্রিটিসিজম বলতে আমরা কী বুঝব?—সহজ কথায় ইকোক্রিটিসিজম হল সেই পাঠ যা সাহিত্য ও প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যেকার সম্পর্ককে বোঝাবে। কিন্তু কোনো লেখার মধ্যে প্রকৃতির কথা থাকলেই তা ইকোক্রিটিসিজমের আওতাভুক্ত হবে না। তাহলে তো প্রায় সব সাহিত্যই ইকোক্রিটিসিজমের আওতাভুক্ত হতো। কারণ প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে সাহিত্য প্রায় হয়ই না। যে পাঠের মধ্যে প্রকৃতিকে নিয়ে লেখকের উদ্‌বেগ উৎকণ্ঠা এবং সর্বোপরি প্রকৃতিকে রক্ষা করার সচেতন চিন্তা ভাবনা থাকবে সেই পাঠকেই 'Eco-Text' এর অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বলাই' গল্পটি এর একটি সার্থক উদাহরণ। বাংলা সাহিত্যে এমন অসংখ্য উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' প্রভৃতি।

আমরা জানি, শুধুমাত্র প্রকৃতি বা শুধুমাত্র মানুষকে নিয়ে উৎকৃষ্ট সাহিত্য হয় না। কোনো একটি উৎকৃষ্ট রচনার মধ্যে প্রকৃতি ও মানুষের সংমিশ্রণ থাকে। দু'য়ের সার্বিক মিশ্রণে সাহিত্য সাহিত্য পদবাচ্য হয়ে ওঠে। যেমন, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' উপন্যাসে প্রকৃতি বন্দনা আছে, কিন্তু সেখানে মানুষও উপেক্ষিত থাকেনি। কারণ প্রকৃতিকে দেখবে তো মানুষ, আস্বাদন করবে তো মানুষ, বর্ণনা করবে তো মানুষ-ই। সাহিত্যিক মাত্রই সামাজিক মানুষ। তিনি শুধুমাত্র সৃষ্টির আনন্দ লাভের উদ্দেশ্য নিয়েই সাহিত্য সৃষ্টি করেন না। তাঁর সৃষ্টির পিছনে অনুপ্রেরণা যেমন থাকে তেমনি সামাজিক দায়বদ্ধতার দিকটিও তাঁর মাথায় থাকে। সামাজিক মানুষ হিসেবে মানুষকে সচেতন করার কাজটি তিনি করেন তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে।

আধুনিক বিশ্বে পরিবেশ সংক্রান্ত ভাবনা-চিন্তা অত্যন্ত জরুরি হয়ে উঠেছে। বলা যায় মানুষ নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে বাধ্য হচ্ছে পরিবেশ নিয়ে ভাবতে। শেষ চার-পাঁচ

দশক আগে থেকে মানুষ পরিবেশ নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে শুরু করেছে। সুইডেনের স্টকহোম শহরে পরিবেশ সংক্রান্ত প্রথম সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৭২ সালে। দ্বিতীয় সম্মেলনটি আয়োজিত হতে গিয়ে মাঝে কেটে গেছে আরও কুড়ি বছর। ১৯৯২ সাল। সেই অর্থে ধরতে গেলে বিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে এসে আমরা পরিবেশ নিয়ে সচতেন হতে শুরু করেছি। আসলে শেষ কয়েক দশক হু হু করে পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি, মানুষের বিলাসবহুল জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়া প্রভৃতির ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পরিবেশ। প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রের অন্যান্য জীবের মতো মানুষও একটি জীব মাত্র। অন্যান্য জীবজগতের কারণে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয় কিনা আমাদের জানা নেই, কিন্তু পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের স্বেচ্ছাচারিতার বিষময় ফল যে প্রকৃতির উপরে পড়ছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

আলোচ্য উপন্যাসের লেখক ব্যক্তিজীবনে কিশোর বয়স থেকেই দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তের পাহাড়, জঙ্গালে ভ্রমণ করে বেড়িয়েছেন। নিজে শিকারও করেছেন। তাঁর এই বিস্তৃত জীবনঅভিজ্ঞতার ছাপ আছে তাঁর লেখায়। জীবনের প্রথম দিকে তিনি মূলত জঙ্গাল, পশু-পাখি, শিকার শুধুমাত্র এইসব বিষয়কেন্দ্রিক লেখার দিকেই মনোযোগী ছিলেন। আমাদের আলোচ্য 'শালডুংরি' উপন্যাসটি তাঁর এমনই একটি উজ্জ্বল সৃষ্টি। তিনি প্রকৃতির মাঝে গিয়ে প্রকৃতিকে ছুঁয়ে দেখেছেন, অনুভব করেছেন। প্রকৃতিকে দূর থেকে দেখে কল্পনার জারক রসে জারিত করে কোনো কিছু লেখা। আর প্রকৃতির মাঝে গিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে আপন হয়ে যাওয়া, দু-চোখ মেলে দেখা এবং সেই অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের সঙ্গে কল্পনার তুলি মিশিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি—এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য বিস্তর। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যে বাস্তবতার ছোঁয়া পাওয়া যায় প্রথম ক্ষেত্রে তা সবসময় সম্ভব হয়ে ওঠে না। তবে মহান স্রষ্টারা অনেক সময় এর ব্যতিক্রমও হন। যেমন, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আফ্রিকাতে না গিয়েও 'চাঁদের পাহাড়' লিখেছেন যা বাংলা সাহিত্যে এক অসামান্য সৃষ্টি।

যাইহোক, এবারে আমরা আলোচ্য উপন্যাসে লেখকের পরিবেশ সচেনতার স্বরূপটি বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব। উপন্যাসটির পটভূমিতে আছে মধ্যপ্রদেশের আদিবাসী অধ্যুষিত পাহাড়-জঙ্গাল ঘেরা একটি জায়গা। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র বাঙালিবাবু। যিনি যৌবনে ইংল্যান্ড স্কটল্যান্ডে সাহেবি কায়দায় জীবন কাটিয়েছেন। ইংরেজ মেমদের সঙ্গাসুখ লাভ করেছেন। ইংরেজদের মতোই নিখুঁত উচ্চারণে ইংরেজি বলতে পারেন। তাঁর মতি পরিবর্তন হয়েছে এই জঙ্গালাকীর্ণ হিংস্র পশু-পাখি অধ্যুষিত শালডুংরিতে এসে। এখানে এসে তিনি জীবনের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করতে পেরেছেন। তাঁর দীর্ঘ টানটান পুরুষালি চেহারা, তাঁর ব্যক্তিত্ব সব মিলিয়ে স্থানীয় মুন্ডাদের চোখে তিনি সম্ভ্রম আদায় করে নিয়েছেন। মুন্ডাদের মাঝে থেকে তাদের ভালো করা সর্বোপরি জঙ্গালের পশু-পাখিদের শিকারিদের হাত থেকে রক্ষা করা তাঁর জীবনের ব্রত হয়ে উঠেছে। জঙ্গালের রক্ষকরূপেই তিনি পরিচিত হয়ে উঠেছেন।

উপন্যাসের শুরুতে দেখা যায় শহুরে বাঙালি যুবক সত্যেন এবং তার দুই বন্ধু শুভেন ও জ্যোতি শিকার করে ফিরছে। বাঙালিবাবু যমদূতের মতো হঠাৎ অবতীর্ণ হয়ে তাদের

পথ আটকেছেন। তাঁকে দেখে সত্যেনদের সঙ্গী স্থানীয় যুবক গুরবা অত্যন্ত ঘাবড়ে গেছে। কারণ সে জানে বাঙালিবাবু শিকার করা পছন্দ করেন না। বাঙালিবাবু রীতিমতো তিরস্কারের সুরেই বলেছেন "ছিঃ ছিঃ শিক্ষিত লোক হয়ে আপনারা শিকার করেন? কোন অধিকারে বনের পশু-পাখি মারেন আপনারা?" উপন্যাসের কথক সত্যেন লেখালিখি করে। বাঙালিবাবুর সঙ্গে এমন আকস্মিক পরিচয়ে এবং বাঙালিবাবুর জঙ্গাল প্রীতির পরিচয়ে মুগ্ধ হয়। তাঁর সম্পর্কে জানতে অত্যন্ত উদ্গ্রীব হয়ে ওঠে। অবশেষে গুরবাকে সঙ্গে নিয়ে বাঙালিবাবুর বাড়িতে একদিন হাজির হয়। বাঙালিবাবু সত্যেনকে দেখে খুশি হন। তাঁর বাড়ির উঠোনেই সত্যেনকে বসার জন্য বলেন—"উঠোনেই বসি কি বলো? রোদ তো এখন মিষ্টিই লাগে। এই রোদ আর হাওয়া আর জল ছাড়া আর তো কিছুই নেই আমাদের এখানে। কিন্তু পনেরো দিন থাকো কলকাতায় আর ফিরতেই ইচ্ছা করবে না।" বাঙালিবাবুর এই আত্মপ্রত্যয় তাঁর নিজের জীবন অভিজ্ঞতাসঞ্জাত। এই বক্তব্যের মধ্যেই তাঁর প্রকৃতিপ্রেমকে চিনে নেওয়া যায়।

সত্যেন এবং গুরবার আগমনে বাঙালিবাবুর একমাত্র ছেলে খুশি হয়নি। সে রাগত স্বরে মুন্ডা ভাষায় বাবাকে কিছু বলে বাড়ি ছেড়ে গ্রামের দিকে চলে গেছে। লেখকের কথায়—"একটু পরেই তার লাল রঙা বাংলনের গেঞ্জি হারিয়ে গেল শীতের ধূলিমলিন সবুজ হিজিবিজি জঙ্গালের গভীরে।" এটা প্রতীকী। প্রকৃতির মাঝে যারা থাকে তারা এভাবেই বোধহয় তাদের সমস্ত রাগ-অহংকার নিয়ে হারিয়ে যায় প্রকৃতির-ই মাঝে। প্রকৃতি সব কিছুকে আপন করে নেয়। বিরাশি বছরের বৃদ্ধ বাঙালিবাবু প্রকৃতিকে অনুভব করতে চান হৃদয় দিয়ে। তিনি বলেন "মানুষের মনের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, এই জঙ্গালের, পাহাড়ের, ঘনান্ধকার রাতের কি বলার আছে সেই সব। তুমি তো শিকারি সত্যেন। এদের কথা কখনও কি শুনতে চেয়েছ?" বাঙালিবাবুর এই প্রশ্নের জবাব সত্যেনের কাছে ছিল না। শুধু সত্যেন নয় আমরা যারা প্রকৃতিকে জড় পদার্থের মতো করেই দেখি, ওপর ওপর চোখ বোলাই তাদের কাছে এই প্রশ্নবাণের জবাব নেই। তিনি নিজে যেভাবে প্রকৃতিকে দেখেন, সেভাবেই প্রকৃতিকে অন্তর দিয়ে দেখতে শেখার চোখ তৈরি করে দিতে চান তিনি।

বৃদ্ধ বাঙালিবাবুর জীবন প্রকৃতির সেবায় প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। তিনি তাঁর অস্তিত্বের সবকিছুতেই প্রকৃতির অনুষঙ্গ মিশিয়ে ফেলেন। তাই তো বলতে পারেন "আমি না কুয়াশা হয়ে গেছি। জানো কুয়াশারই মতো আমি সিক্ত, বিস্তৃত, অস্পষ্ট হয়ে গেছি।" শুধু তাই নয় নব্য প্রজন্মকেও বলেন "তোমাদের প্রজন্ম হচ্ছে বিদ্যুতের প্রজন্ম।... তোমরা দপ করে জ্বলে উঠে ঝুপ করে নিভে যাও।" বৃদ্ধ তাঁর মনের কথা বলার মতো মানুষ পান না। সত্যেনকে পেয়ে তাঁর মনের কপাট খুলে গেছে। তবে তিনি সত্যেনের মতো সমঝদার মানুষ না পেলেও তাঁর অন্তরের কথা প্রকৃতির সঙ্গে ভাগ করে নেন। তিনি তাঁর কথা আকাশ, নদী, পাহাড়, গাছ এদের বলেন।

বৃদ্ধ নিজে একনিষ্ঠ প্রকৃতিপ্রেমিক। তাঁর সংস্পর্শে আসা মানুষদের অন্তরেও প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসার বীজ বুনে দিতে চান তিনি। যেমন করে স্থানীয় মুন্ডাদের মনে বুনে

দিয়েছেন। যেমন করে সত্যেনের মন পরিবর্তন করেছেন। তিনি জানেন একা প্রকৃতিকে ভালোবাসা যায় কিন্তু রক্ষা করা যায় না। দশ জনের মনে প্রকৃতির প্রতি ভালোবাসার বীজ বুনে দিতে পারলে রক্ষা করা সহজ হয়ে যায়।

উপন্যাসটির এক তৃতীয়াংশই বৃন্ধের আত্মজীবনী, যা ডায়েরির ঢং-এ লেখা। যে ডায়েরি বৃন্ধ সত্যেনকে পড়তে দিয়েছেন। বৃন্ধ নিজেও বন্ধুদের সঙ্গে শালডুংরিতে বেড়াতে এসেছিলেন। অন্য বন্ধুরা ফিরে গেলেও তিনি ফেরেননি। প্রকৃতির প্রতি অমোঘ টান অনুভব করে জঙ্গলাকীর্ণ শালডুংরিতেই বাকি জীবন কাটিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। জঙ্গলের মাঝে তাঁর বাকি জীবন কাটিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত আরও দৃঢ় হয়েছে মুন্ডা তরুণী হনসোর সান্নিধ্যলাভে। দেশ-বিদেশের সাদা চামড়ার তরুণীদের সান্নিধ্যে তিনি যে শারীরিক তৃপ্তি পেয়েছিলেন তার মধ্যে সেই পরিপূর্ণতা ছিল না, যা তিনি দেশজ প্রকৃতির কোলে হনসোর সঙ্গে মিলনে পেয়েছেন। আদিবাসি রমণী হনসোর শরীরের মধ্যেই তিনি দেশজ মাটির সোঁদা গন্ধ পান।

বনবালা হনসোকে ভালোবেসে বিয়ে করে নির্জন অরণ্যে বসবাস করার পিছনে প্রকৃতিই প্রধান উদ্দীপক হয়ে উঠেছে। তা তাঁর ইংরেজ প্রেমিকা মার্গারেটের কাছে চিঠি লিখে তিনি জানিয়েছেন—তোমার সঙ্গে আমার সংস্কৃতিগত, ভাষাগত, জীবনযাত্রাগত যতটুকু অমিল ছিল, হনসোর সঙ্গে হয়তো তার চেয়েও অনেকেই বেশি অমিল। কিন্তু আসল ব্যাপারটা হচ্ছে প্রকৃতির সান্নিধ্য। আমাদের দেশের অরণ্য-পর্বতের সৌন্দর্য, ভারতীয় প্রকৃতির গহন গভীর রহস্যময় স্বরূপ ব্যক্তিত্বের স্বরূপ তোমাদের দেশে বসে তোমরা ভাবতে পর্যন্ত পারো না। আমাদের মুনি-ঋষি, দার্শনিকেরা হাজার হাজার বছর আগেও কেন যে বনে বা পাহাড়ে আসতেন তাঁদের 'বোধির' জন্যে, জীবনের মানে খোঁজার জন্যে, দিক ঠিক করার জন্যে, তা এমন পরিবেশে না এলে, বেশ কিছুদিন না থাকলে, বোঝা পর্যন্ত যায় না।

বনের মধ্যে বাস করতে করতে বনের জীববৈচিত্র্য, বাস্তুতন্ত্রের প্রাকৃতিক ভারসাম্য দেখে বাঙালিবাবু অভিভূত। তাই তাঁর যাবতীয় রাগ মানুষের উপর। প্রকৃতির ক্ষতিকারক জীব একমাত্র মানুষ। মানুষ তাঁদের স্বার্থে, উন্নত জীবন-যাপনের স্বার্থে প্রকৃতির ক্ষতিসাধন করে নির্বিচারে। বাঙালিবাবুর কুঁড়ে ঘরের দু'মাইল দূরে বিন্দিয়া নদীর দহে জঙ্গলের প্রায় সমস্ত প্রাণী গ্রীষ্মের খরতাপে জল খেতে আসে। শিকারের সুবিধার জন্য দহের ওপরে মস্ত বড়ো শক্তপোক্ত মাচা বানানো। বাঙালিবাবুও প্রথম প্রথম ওখানে শিকারে যেতেন। কিন্তু আদিবাসী জীবনে পরিবর্তিত বাঙালিবাবু যান শিকারিদের হাত থেকে বনের নিরীহ পশুদের বাঁচাতে। বেসিক চাহিদার ক্ষেত্রে বনের পশুদের যে সহাবস্থান তা তাঁকে অবাক করে—

> প্রকৃতির এই বৈচিত্র্যের মধ্যে এমন এক ধরনের ভারসাম্য দেখি যে, তা বলার নয়। যিনি জীব সৃষ্টি করেছেন তিনিই তাদের খাদ্য সংস্থান করে পাঠিয়েছেন। সৃষ্টিতে একমাত্র মানুষের মতো ধূর্ত, লোভী, কাণ্ডজ্ঞানহীন জানোয়ার ছাড়া অন্য কোনো প্রাণীরই কোনো নালিশ নেই বিধাতার কাছে। বনের আইন যে শহরের আইনের চেয়ে অনেকই

> ন্যায্য, অনেকই উদার এ কথাটা বোঝার মতো সময় বা মানসিকতা বোধ হয় আমাদের মতো তথাকথিত শিক্ষিতের নেই।"

শ্রেষ্ঠ জীব মানুষকে, বলা যায় শিক্ষিত মানুষকে চোখে আঙুল দিয়ে অশিক্ষার স্বরূপ দেখিয়ে দিয়েছেন লেখক। লেখকের প্রকৃতিপ্রেম প্রকৃতিকে রক্ষা করার জন্য নিরন্তর ভাবনা-চিন্তা সমগ্র উপন্যাস জুড়ে প্রতীয়মান। যে বন-জঙ্গলকে ভালোবেসে বাঙালিবাবু তাঁর সমস্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিয়ে মুন্ডা রমণী হনসোকে বিবাহ করে শালডুংরিতে পাকাপাকিভাবে বসবাসের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সেই বন-জঙ্গল স্বার্থপর-অর্থলোভী মানুষের দুষ্ট চক্রান্তে একদিন ধ্বংস হয়ে যেতে পারে এই আশঙ্কার সিঁদুরে মেঘ তাঁর মনে উঁকি দেয়—"কোনোদিন যদি কোনো দুষ্টবুদ্ধি রাজনৈতিক নেতা অথবা স্বার্থান্ধ, নীতিবোধহীন, গরিবের উপর অত্যাচারী, অসৎ শাসকের অদূরদর্শিতা এই সরল আদিবাসীদের উত্তেজিত করে তুলে তাদের জীবনেরই সমার্থক বনকে বিনাশ করতে উদ্‌বুদ্ধ করায় তার চেয়ে দুঃখের আর কিছুই থাকবে না। বন শুধু আদিবাসীদেরই নয়, আমাদেরও 'অন্য মা'। বন নিধন আর মাতৃহত্যা সমান পাপ।" প্রকৃতির প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা না জন্মালে এই বোধে উপনীত হওয়া যায় না।

গ্রীষ্মের দাবদাহে জীবজগতের মতো উদ্ভিদ জগতেরও প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে যায়। বাঙালিবাবু জঙ্গলের গাছ-গাছালির এই কষ্ট দেখে ব্যথিত হন। গাছের জন্য তাঁর প্রাণ কাঁদে—"গ্রীষ্মের যে দাবদাহ তা অরণ্য গভীরে না থাকলে অনুভব করা যায় না। প্রতিটি গাছ, প্রতিটি ঘাস, লতা ফুল, পাতা যেন এক অনন্ত তৃষ্ণায় জ্বলতে থাকে। তীব্র অকরুণ রোদে ঝলসে যেতে থাকে।" আবার এই গ্রীষ্মের দাবদাহের পর যেদিন বর্ষা নামে প্রকৃতি জগতে এক বিপুল সাড়া পড়ে যায় ওষ্ঠাগত প্রাণে নবজীবন সঞ্চার হয় "অথচ যেদিন প্রথম বর্ষা নামে, সেই এক রাতের বৃষ্টিতে, যখন অগণ্য গাছে গাছে কিশলয় আসে, অঙ্কুরিত সবুজ, তখনই যেন জীবন মরণের প্রকৃত মানে বোঝা যায়।" লেখক প্রাণীজগতের সঙ্গে উদ্ভিদজগতের জীবন ধর্মকে এভাবেই একাত্ম করে দেখিয়েছেন বাঙালিবাবুর চোখ দিয়ে।

লেখকের প্রকৃতিকে ভালোবাসার নিদর্শন চরমে পৌঁছায় যখন তিনি বাঙালিবাবুকে আঁকেন বন রক্ষাকর্তা রূপে। যে বাঙালিবাবু একদিন শিকারি সেজেই শালডুংরিতে এসেছিলেন সেই তিনিই বন ও বন্যপ্রাণীদের রক্ষাকর্তা হয়ে উঠলেন। বন্যপ্রাণী হত্যাকারী মানুষদের প্রতি তাঁর দয়া-মায়ার লেশমাত্র নেই। তিনি আজ বন্যপ্রাণী শিকার করতে পারেন না, কিন্তু বন্যপ্রাণী শিকারোন্মুখ মানুষ শিকারে তাঁর হাত কাঁপে না। তাই তিনি বলেন—"বিষ মাখানো তীর আর ধনুক নিয়ে আমি বসে আছি আজ। জানোয়ার শিকারের জন্য নয়, জানোয়ারেরও অধম যে-সব মানুষ এমন নিরুপায় পশু-পাখিদের ভরা-গ্রীষ্মে জলের পাশে মারে তাদের মারার জন্যে।" শিকারিদের সঙ্গে এই যুদ্ধে তাঁর প্রাণও যেতে পারে তা তিনি জানেন, কিন্তু তাতেও তিনি পিছপা নন। প্রকৃতির সেবায় যিনি নিজের গোটা জীবন উৎসর্গ করেছেন তাঁর কাছে প্রকৃতির জন্য নিজের প্রাণ দেওয়াও বোধহয় পুণ্যের।

উপন্যাসে দেখা যায় শিকার করতে আসা ব্যক্তিদের লেখক যথোপযুক্ত শাস্তি দিয়েছেন। কেউ অসাবধানতাবশত তার নিজেরই বন্দুকের গুলিতে আহত হয়েছেন। আবার স্ফীতোদর পুলিশের বড়োবাবুকে ভাল্লুকে ধরার বর্ণনাও লেখক চমকপ্রদ রসিকতার সঙ্গে দিয়েছেন—

> জঙ্গলে জায়গার দারোগা। রোজ রোজ মোরগ, আণ্ডা, পাঁঠা, হরিণ, ঘি খেয়ে প্রায় চলচ্ছক্তিহীন হয়ে পড়েছিলেন। ভাল্লুকে সচরাচর মানুষের মাংস খায় না। কিন্তু না খেলে কি হয় সুযোগ ঘটলেই সে মানুষের মাংস নিয়ে লুচির মতো খেলে। আমার মনে হল মারি এক বিষের তীর ভাল্লুকটাকে বড়োবাবুকে বাঁচাতে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল মানুষটার চেহারা দেখেই তার শাস্তি হওয়া দরকার।

উপন্যাসটি পড়তে পড়তে বাঙালিবাবুর মতো পাঠকেরও মনে এইসব তথাকথিত শিক্ষিত লোভী মানুষের প্রতি ঘৃণা জন্মায়। এই সব মানুষকে বাঘে, ভাল্লুকে ধরলে অনুকম্পা না হয়ে আনন্দ হয়। এখানেই ঔপন্যাসিকের সার্থকতা।

প্রবল গ্রীষ্মের দুপুরে জঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত পানীয় জলের হ্রদে নির্বিঘ্নে যাতে বন্যপ্রাণীরা জল পান করতে পারে, বনের বাস্তুতন্ত্র যাতে বজায় থাকে তার জন্য বাঙালিবাবু সদা সর্বদা সচেতন। যে জঙ্গলকে ভালোবেসে তিনি তাঁর আরামের উন্নত জীবন-যাপন ত্যাগ করে জঙ্গলে ঘাঁটি গেড়েছেন সেই জঙ্গলকে তিনি কিছুতেই নষ্ট হতে দিতে পারেন না। জঙ্গলের প্রাণীরা না থাকলে জঙ্গল থাকে না। তাই তিনি বিপদ সঙ্কুল অরণ্য মাঝে কুঁড়েঘরে গর্ভবতী স্ত্রীকে একা রেখে তার বারণ সত্ত্বেও নদীর উপরে মাচায় গিয়ে পাহারা দিতে বেরিয়ে যান। পুলিশের ও বন বিভাগের লোক অর্থাৎ আইনের রক্ষকরাই যখন ভক্ষক হয়ে ওঠে তখন তিনিও ততোধিক কঠোর হয়ে যান। তাঁদের প্রতি বিন্দু মাত্র দয়া-মায়া দেখানোর প্রয়োজন বোধ করেন না। পুলিশের দারোগার দুই সাকরেদ যখন শম্বর, ময়াল সাপ মারে মাংস ও চামড়ার লোভে তিনি নিজেকে শান্ত রাখতে পারেন না—

> এদের কথাবার্তা, চেহারা মনোভাব আমাকে বড়ো ঘৃণাতে ভরে দিল। আমি ঠিকই করে ফেললাম যে একজন চলে গেলে অন্যজনকে আমি বিষের তির মেরে শেষ করে দেব। পুলিশের এবং বন বিভাগের আমলারা যেখানে যোগ সাজশ করে সমস্ত প্রাণী ও পাখি নির্মূল করার ষড়যন্ত্র করেছে, সেখানে এমন কিছু না করলেই নয়। যারা যে ভাষা বোঝে তাদের সেই ভাষাতেই শিক্ষা দিতে হয়।

পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখের একটাই কারণ আমরা অর্থাৎ মানুষেরা যাদের উচিৎ পৃথিবীকে রক্ষা করা অন্তত নিজেদের বেঁচে থাকার স্বার্থে আমরা তা না করে ক্রমাগত ভোগবিলাসে মত্ত হয়ে উঠেছি। এককথায় রক্ষকের পরিবর্তে ভক্ষক হয়ে উঠেছি। আমার বুদ্ধি-মেধা-বিজ্ঞানচেতনা ভালো কাজের পাশাপাশি খারাপ কাজেও নিয়োজিত করছি।

উপন্যাসে বাঙালিবাবুর গলায় যে আক্ষেপ ও আশঙ্কার সুর শোনা যায় তা আজ একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে যে-কোনো পরিবেশ সচেতন মানুষের মনের কথা। "এই পৃথিবী সৃষ্টি হতে লেগেছিল বহু কোটি বছর। ভাবলে দুঃখ হয় যে, বিধাতার শ্রেষ্ঠতম

জীব মানুষ, যার উপর ভার ছিল এই পৃথিবীকে ফুল-ফলন্ত, সুখ-ভরন্ত করে রাখার, সেই অহং সর্বস্ব মানুষই এই পৃথিবীকে কত অল্প সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ প্রলয়ের দিকে প্রচণ্ড বেগে টেনে নিয়ে এল। এই ধ্বংসের গতি দুর্বার।" বা তিনি যখন বলেন—"প্রকৃতি, পশুপাখিরই মতো, মানুষকেও তার জীবনধারণের সমস্ত মূল উপাদান দিয়ে রেখেছিলেন। অন্য সব প্রাণীরই কুলিয়ে গেল, শুধুমাত্র মানুষেরই কুলোল না তাতে...। আধুনিক বিজ্ঞান-বিশ্বাসী, হাজার আরামে অভ্যস্ত শহরবাসী আধুনিক মানুষের মুক্তির কোনো উপায়ই বোধহয় আর নেই। সে থামবে শুধুমাত্র নিজের ধ্বংস সম্পূর্ণ হলেই।" বাঙালিবাবু যেমন করে ভাবতে পারেন তেমন করে আমরা যদি ভাবতে পারতাম তাহলে এত তাড়াতাড়ি পৃথিবীর এই দুর্দশা বোধহয় হতো না। পৃথিবীকে আমরা আরও 'সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা' দেখতে পেতাম।

সমগ্র উপন্যাসে বাঙালিবাবু নাম গোত্রহীন। আসলে নামের তুলনায় তাঁর কাজ বড়ো হয়ে উঠেছে। তাই তাঁর নাম না জানলেও উপন্যাসের রসাস্বাদনে বিঘ্ন ঘটে না। লেখকও তাঁর নামকরণের আগ্রহ প্রকাশ করেননি। শালডুংরি ও সংলগ্ন এলাকার আদিবাসীরা পরম শ্রদ্ধায় তাঁর কাছে মাথা নত করে। তাঁকে যেমন ভক্তি করে তেমনি ভয়ও পায়। মুন্ডাদের সঙ্গে থেকে তিনি মুন্ডাদের মতো জীবন-যাপন বেছে নিয়েছেন। আচার আচরণে জীবনচর্যায় তিনি মুন্ডা হয়ে উঠেছেন—তার ফলে মুন্ডাদের কাছে তিনি পরম শ্রদ্ধার পাত্র হয়ে উঠেছেন। শুধু মুন্ডাদের কাছেই নয় বাঙালিবাবুর রোমহর্ষক ডায়েরির পাঠক সত্যেনও তাঁর প্রতি পরম শ্রদ্ধাশীল হয়ে পড়েছে। তাইতো শেষপর্যন্ত তার উপলব্ধি হয় যে কৈশোরকাল থেকে বনে-জঙ্গলে অনেক ঘুরলেও আরণ্যক জগতের স্বরূপ সম্পর্কে তার বিন্দু মাত্র ধারণা গড়ে ওঠেনি। বাঙালিবাবুর সঙ্গে পরিচয় হয়ে তাঁর ডায়েরি পাঠ করে সত্যেন সেই উপলব্ধির আলোকে উপনীত হয়েছে। আমরা সাধারণ মানুষেরা সত্যেনের মতোই। আমরা ভাসা ভাসা চোখে প্রকৃতিকে দেখি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হই। প্রকৃতির বাহ্যিক সৌন্দর্যের মতোই অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য যে আছে তা দেখার বা বোঝার চেষ্টাই করি না। প্রকৃতির সুন্দর রূপ কিভাবে অটুট থাকবে সেই কথা ভাবার বা সেই অনুযায়ী কাজ করার তাগিদ অনুভব করি না। আমরা নিজেদের সৌন্দর্য পিপাসা চরিতার্থ হলেই খুশি হয়ে যাই। কিন্তু বাঙালিবাবুর মতো কিছু ব্যতিক্রমী মানুষেরা থাকেন যাঁদের জন্য পৃথিবীটা আজও সুন্দর। উপন্যাসের শেষে সত্যেনের উপলব্ধি হয়েছে বাঙালিবাবু একজন 'বাঘ'। ঠিকই, বাঘ যেমন করে জঙ্গলকে রক্ষা করে বাঙালিবাবুও প্রায় একক প্রচেষ্টায় সেইভাবেই রক্ষা করে চলেছেন তাঁর সন্নিহিত জঙ্গলকে।

উপন্যাসটি পড়তে গিয়ে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' উপন্যাসের প্রসঙ্গ বারে বারে মাথায় আসে। ব্যাপ্তিতে ও শিল্পগুণে 'আরণ্যক' মহৎ সৃষ্টি সন্দেহ নেই। কিন্তু এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক তাঁর আদর্শ চরিত্র বাঙালিবাবুর মাধ্যমে প্রকৃতিকে রক্ষা করার যে জোরালো প্রচেষ্টা চালিয়েছেন তা আরণ্যকে নেই।

উপন্যাসটিতে লেখকের প্রকৃতিভাবনা অত্যন্ত প্রকটভাবেই আছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রকৃতিকে মানুষের লোভের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য লেখকের সচেতন প্রয়াস লক্ষণীয়। জঙ্গলের বুকে বাস করা আদিবাসীরা নয় বরং শিক্ষিত সভ্য মানুষের প্রতি লেখক ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। তবে প্রকৃতির পটভূমিকায় রচিত এই উপন্যাসের বিরাট অংশ জুড়ে লেখক তাঁর অধ্যাত্মজ্ঞান, দেশ-বিদেশের দার্শনিকদের তত্ত্বকথা, উদ্ধৃতি চয়ন প্রভৃতি করেছেন যা উপন্যাসের স্বাভাবিক গতিকে ক্ষুণ্ণ করেছে এবং সর্বোপরি উপন্যাসটির শৈল্পিক উৎকর্ষতার পক্ষে অন্তরায় হয়েছে। তবে প্রকৃতি পাঠ হিসেবে উপন্যাসটির গুরুত্ব অপরিসীম।

উৎসের সন্ধানে

১. মোহিত রায় ও ভূপতি চক্রবর্তী সম্পাদিত : 'পরিবেশ', প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৮

২. Goltfelty, Cheryll and Harold (eds), 'The Ecocritism reader : landmarks in Literary ecology', Athens and London, University of Georgia, 1996

৩. বুদ্ধদেব গুহ : 'সেরা নয়টি উপন্যাস', নবারুণ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৩